প্রত্যক্ষ হ'ল বস্তুটির সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান (knowledge)। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী মনের এই স্তরবিন্যাস করেছেন।

*মনের স্বরূপ*

সাংখ্যমতে মন নানা অংশে বিভক্ত, তাই মনের পক্ষে একই সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হবার কোন বাধা নেই। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের মতে মন অবিভাজ্য একক (indivisible whole)। দেহ ও মন যে পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল—সাংখ্য বিবর্তনতত্ত্বে তা প্রমাণিত, আর এ সত্য স্বীকৃত আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে।

*স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশই শিক্ষা*

শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রেও সাংখ্যতত্ত্বের পুরুষের স্বভাববৈচিত্র্য অনুসরণীয়। প্রতিটি ব্যক্তির প্রকৃতি অনুসারে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। **সক্রিয়তা, উপযোগিতা, উদ্যমশীলতা হবে শিক্ষায় অনুসৃত নীতি।** আর **সাংখ্যতত্ত্ববিজ্ঞান যেমন সব বিষয়, বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের কথা বলেছে,** তেমনি পাঠ্যক্রম রচনায় নানা আগ্রহকে স্থান দিতে হবে। সাংখ্যদর্শন মূলতঃ **দ্বৈতবাদী বস্তুবাদ (Dualist realism)** হলেও প্রকৃতিবাদের স্পর্শ এতে রয়েছে। **ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের যে তত্ত্ব তা সাংখ্যমত অনুসারী।**

সাংখ্যমুক্তিতত্ত্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে সত্য সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের ওপর। জ্ঞানই সমস্ত দুঃখমুক্তির প্রধান সহায়। শিক্ষার আদর্শও জ্ঞানলাভ, তারই ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যক্তির ও সমাজের সাফল্য।

আধুনিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব সাংখ্যতত্ত্ব থেকে অনেক কিছু সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে। তার মধ্যে প্রধান হ'ল—**জড়বস্তু ও প্রাণপ্রবাহ** দুই এর মিলনেই মানবজীবনের উত্তরণ। এ উপলব্ধি জ্ঞানে ও কর্মে, তবেই জ্ঞানের মুক্তি ও জীবনের জয়।

বিবর্তন মাত্র। যা অব্যক্ত ছিল, তা অভিব্যক্ত হয় সৃজন প্রক্রিয়াতে। তাই কোন ব্যক্তির প্রবণতা, ক্ষমতা, রুচি, আগ্রহ অনুসরণ না ক'রে তাকে পরিচালনা করা যায় না। আর বিশ্বসৃষ্টি প্রক্রিয়ার মত প্রতিটি জীবই, বিশেষ করে মানুষ সৃষ্টিশীল (creative)। সৃষ্টিশীলতাহীন এমন কোন ব্যক্তিত্ব কল্পনামাত্র (non-creative person is a figment of imagination)। সৃষ্টির মত ধ্বংসও কোন অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, এই বিবর্তন চক্রাকারে চলে, অর্থাৎ কখনও সৃজন, কখনও তার স্থিতি, কখনও তার অবসান—অর্থাৎ কোথাও কোন আরম্ভ বা শেষ নেই, সব কিছু গতিময়তায় ভাসমান। শেষতঃ, এই বিবর্তন প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যমুখী এবং এই উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু হইল ব্যক্তি-সত্ত্বা—তার শ্রেণী (Species) নয়। এই বিবর্তনতত্ত্ব শিক্ষার আধুনিক সংজ্ঞায় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষার অর্থ হ'ল—এই প্রক্রিয়া গতিশীল আত্মবিকাশ প্রক্রিয়া। **শিক্ষার অর্থই হ'ল আত্মসক্রিয়তা, সৃজনশীলতা ও নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার নিরিখে জ্ঞানের পুনর্গঠন ও পুনর্রূপান্তর**। এই গতিময়তার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্ধিত হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে নতুন নতুন আঙ্গিকে।

*প্রতিটি জীবন সৃজনশীল*

*উদ্দেশ্যমুখী*

*শিক্ষা গতিশীল আত্মবিকাশ প্রক্রিয়া*

সাংখ্যসৃষ্টিতত্ত্বে প্রথম উৎপন্ন যেটি, সেটি হ'ল **বুদ্ধি**। **এই বুদ্ধি মননশীল মানুষের প্রধান সম্পদ**। তাই এটির গুরুত্ব অসীম। **এই বুদ্ধি, মন ও অহংকার** এদের কাজ ব্যক্তির অন্তরে। বাইরের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্বস্তুর জ্ঞান আহরণে **মন, বুদ্ধি** ব্যক্তিকে সহায়তা করে। সাংখ্যে কোন বস্তু বা বিষয় জানার প্রক্রিয়ায় যে কতকগুলি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে খুবই মূল্যবান। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে জানার উৎস হিসাবে **'প্রত্যক্ষ'** একটি বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে। ইন্দ্রিয় তো জ্ঞান আহরণের দ্বারস্বরূপ। **সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় বস্তুর সংযোগে যে ছাপ** তৈরি হয় **সেটিকে মন বুদ্ধি পর্যালোচনা করে**— এবং নির্বাচন ও বর্জন (selection and elimination) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্টতায় উন্নীত হয় ও তখন বস্তু বা বিষয়টির সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। এই যে সরল থেকে জটিলে, মূর্ত (concrete) থেকে অমূর্তে (abstract) জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরবিন্যাস, তা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত। তাই জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুদের ইন্দ্রিয় সঞ্চালন, ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা আবশ্যিক অঙ্গ। ইন্দ্রিয় অনুশীলিত হলে তবেই মনের দরজায় বুদ্ধির আয়নায় তাদের **তথ্যসামগ্রীর** জ্ঞান সৌধ হয়ে গড়ে ওঠে। সাংখ্যমতে **প্রত্যক্ষের দুটি ধরন** একটি নির্বিকল্প, আর একটি সবিকল্প। নির্বিকল্প মনের প্রাক্‌চেতন (preconscious layer of mind) স্তরে স্থান পেয়েছে।

*বুদ্ধির তাৎপর্য*

*প্রত্যক্ষ*

*জানার প্রক্রিয়া*

*প্রত্যক্ষ-দ্বিবিধ— নির্বিকল্প ও সবিকল্প*

*প্রথমে সংবেদন ও পরে প্রত্যক্ষ*

মনোবিদ্ James-কে অনুসরণ ক'রে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে আমরা নিছক সংবেদন বলতে পারি। সংবেদন কিন্তু জ্ঞান নয়, সংবেদন হ'ল বস্তুটির সঙ্গে নিছক পরিচয় (acquaintance) আর প্রত্যক্ষ বা সবিকল্প

*শব্দ*

**শব্দ ঃ** সাংখ্য মতে শব্দ আর একটি প্রমাণ বা প্রমার উৎস। সাংখ্য দার্শনিকেরা বেদ-ভিত্তিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।

*সাংখ্যমতে মুক্তি তত্ত্ব*

**সাংখ্যমতে মুক্তি তত্ত্ব ঃ** সাংখ্যমতে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতিই মুক্তি। এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য যোগদর্শন বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছে। পরে আমরা তা আলোচনা করব।

এতক্ষণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা সাংখ্য দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলাম। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক মনন জগতে, শিক্ষার তত্ত্বে ও প্রয়োগে কতখানি, তা ভেবে দেখার বিষয় বলে মনে করি।

### ● আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে ও প্রয়োগে সাংখ্যদর্শনের মূল বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ঃ

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিমূলক বৈষম্য (Individual difference) একটি অবশ্যস্বীকার্য সত্য এবং এই মূলনীতিটিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শন আত্মার গুণগত পার্থক্য অনুসারে আত্মার বহুত্ব তত্ত্ব প্রচার করেছে। সাংখ্যের এই তত্ত্বটি সমালোচিত হলেও এর কিছু সত্যতা রয়েছে।

*ব্যক্তি বৈষম্য*

সাংখ্যদর্শন বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছে তা খুবই বৈজ্ঞানিক। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার বীজগুলি এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বকে **জড় বস্তু ও শক্তির সমন্বয়ে** গঠিত বলে ব্যাখ্যা করে। সাংখ্যতত্ত্বে অচেতন, জড় অথচ সক্রিয় প্রকৃতি যখন চেতন, শক্তি সম্পন্ন, নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যে আসে, তখনই সৃষ্টি সম্ভব। আরও বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আগে প্রকৃতির গুণগুলি সাম্যাবস্থায় থাকে, পুরুষ যখন প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসে, অর্থাৎ শক্তি (Energy) আর জড়বস্তু (matter) যখন কাছাকাছি আসে, তখনই সাম্যাবস্থা (equilibrium) বিঘ্নিত হয় ও সৃষ্টি শুরু হয়। এই তত্ত্বাংশটির সঙ্গে **Newton-এর গতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। Newton-এর গতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রটি হ'ল**—'বাইরে থেকে বিচলনের কারণ না এলে কোন বস্তু তা গতিময় হোক্ কি গতিহীন হোক্—তার কোন পরিবর্তন হয় না' (a body in motion or at rest continues to be so unless it is disturbed from outside.)

*বস্তু ও শক্তির সংমিশ্রণে সৃষ্টি*

**সাংখ্য বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক।** প্রথমতঃ, এটি বস্তুর নিত্যতা ও শক্তির নিরন্তর কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, তার কর্মপ্রবণতা শিক্ষা পরিবেশের পরিচালনার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ **শিক্ষার্থীর প্রকৃতি** (heredity or nature) এবং **শিক্ষার্থীর পরিমণ্ডল** (Environment or Nurture) এদের সক্রিয় প্রতিবর্তক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে **কর্মমুখীনতার** তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় সাংখ্যদর্শনে। সাংখ্য কার্যকারণতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছে, সবসময় **কারণের মধ্যে কার্যের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। শূন্য থেকে কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় না,** অর্থাৎ যা আজ ঘটবে তার সম্ভাবনা গতকাল ছিল। সৃষ্টি প্রক্রিয়া কোন সুপ্ত সম্ভাবনার

*সাংখ্য বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক*

*কর্মমুখীনতা*

*কারণের মধ্যে কার্য থাকে*

সাংখ্যমতে প্রকৃতির বিবর্তনের ফলে বস্তু উৎপন্ন হয়। আত্মা দোষগুণ অনুসারে কর্মফল ভোগ করে। প্রকৃতির বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আত্মার মুক্তিলাভ। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেই আত্মা মুক্ত হয়।

## ➢ সাংখ্যমতে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ➢

সাংখ্যদর্শন প্রমার তিনটি উৎসকে স্বীকার করে, এগুলি হ'ল—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

সাংখ্যদর্শনে প্রমা কোন বস্তুর বিশেষ ও সত্যজ্ঞান। সাংখ্য এই জানার প্রক্রিয়াকে একটু অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে। সব প্রমার তিনটি উপাদান আবশ্যিক অঙ্গ—একটি হ'ল **প্রমাতা**, যে জান্‌ছে, দ্বিতীয়টি হ'ল **প্রমেয়**, অর্থাৎ যা জানা যাচ্ছে, আর **জানার উৎস হ'ল প্রমাণ**। বুদ্ধির আত্মাতে বিষয়াকারে যে প্রতিফলন হয়, তাই প্রমাণ। সাংখ্যদর্শনে বুদ্ধি অচেতন। সেই বুদ্ধি যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন বিষয়ের আকার ধারণ করে এবং ঐ আকারে রূপায়িত বুদ্ধি চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে প্রতিফলিত হয়, তখনই প্রমা বা সত্যজ্ঞান সম্ভব। এই জানা কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়—প্রথমত, ইন্দ্রিয় বস্তুর সংস্পর্শে আসে, দ্বিতীয়ত এই সংযোগের ফলে ইন্দ্রিয়গুলিতে একটি ছাপ (impression) পড়ে। তৃতীয়ত, মন, বুদ্ধি একে বিশ্লেষণ করে। চতুর্থত, বুদ্ধি যে স্বরূপত অচেতন, তাই বিষয়টিকে সরাসরি জানতে পারে না, কিন্তু বিষয়ের আকারে আকারিত হয়। বুদ্ধিতে সাত্ত্বিক গুণ থাকার ফলে তা আত্মার চেতন অংশে প্রতিফলিত হয়, ও শেষে বুদ্ধির প্রতিফলনের সাহায্যে আত্মা বস্তুটিকে জানে।

*জানার প্রক্রিয়া*
*(১) ইন্দ্রিয় বস্তু সংযুক্ত (২) ইন্দ্রিয়তে ছাপ (৩) মন ও বুদ্ধির দ্বারা এদের বিশ্লেষণ (৪) বুদ্ধি বস্তুর আকার ধারণ করে (৫) চেতন অংশে বুদ্ধি প্রতিফলিত হয় তখন জানা সম্ভব*

## ➢ প্রত্যক্ষ ➢

**প্রত্যক্ষ দুধরনের—নির্বিকল্প ও সবিকল্প।**

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় ও বস্তুর সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। এই প্রত্যক্ষ একেবারেই **সংবেদন (sensation), বাক্যে একে প্রকাশ করা যায় না**। এই অবস্থাকে **আলোচনা** বলা হয়। শিশুর যেমন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সংবেদন হয়, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না বিষয়টির নির্দিষ্ট স্বরূপ, তেমনি নির্বিকল্প প্রত্যক্ষেও শুধু সংবেদন হয়। দ্বিতীয় অবস্থা হ'ল সবিকল্প প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাতার পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন সে বলতে পারে—'এটি একটি টেবিল', 'এটি বই' ইত্যাদি।

*প্রত্যক্ষ দুধরনের নির্বিকল্প ও সবিকল্প*

**জ্ঞানের দ্বিতীয় উৎস হল অনুমান**। সাংখ্যদর্শন মতে কার্যকারণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্র ধরে আমরা প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে পৌঁছাই। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা আগুন ও ধোঁয়ার একটি অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক সব সময় দেখেছি। তাই যখনই ধোঁয়া দেখছি তখনই আগুনের অস্তিত্ব অনুমান করছি। এই অনুমান সদর্থক ও নেতিবাচক হ'তে পারে।

*অনুমান*

প্রকাশ করে ও অন্যবস্তুর প্রকাশেও সাহায্য করে। কতকগুলির গুণের সমষ্টি এই বুদ্ধি, যেমন জ্ঞান, ধর্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য। কিন্তু এই বুদ্ধি যখন তমোগুণের দ্বারা দূষিত হয়, তখন সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, ফলে কতকগুলি অসৎগুণ যেমন, অজ্ঞান, অধর্ম, অশক্তি ও আসক্তি বুদ্ধিকে আবৃত করে। এই বুদ্ধি মানুষের সমস্ত বৌদ্ধিক কাজকর্মের উৎস স্বরূপ।

*(১) বুদ্ধি*

মহৎ অথবা বুদ্ধি থেকে অহংকারের সৃষ্টি। অভিমান অহংকারের বৈশিষ্ট্য। জগতের বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে আমাদের মনোভাবকে চিহ্নিত করে এই অহংকার। 'এটা আমার', 'এই কাজ আমি করলাম'—ইত্যাদি বলার সময় অহংকারের প্রকাশ হয়। গুণের অনুপাতিক বৈষম্যের দরুন অহংকার তিন ধরনের—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, ও মন উৎপন্ন হয়, তামস গুণ থেকে পাঁচটি তন্মাত্রা অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রসের সূক্ষ্মরূপ। এই পাঁচটি তন্মাত্রা থেকে পাঁচটি মহাভূতের সৃষ্টি (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)। রাজস গুণ এই দুই গুণের বিভিন্ন কাজে, এদের পরিবর্তনে সহায়তা করে, এদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় হ'ল—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় হ'ল—বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। মন হ'ল এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র। সব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন যুক্ত হতে পারে। মনের নির্দেশ ছাড়া কোন জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। মন, বুদ্ধি ও অহংকারকে একত্রে অন্তঃকরণ বলা হয়।

*(২) অহংকার*

*সাত্ত্বিক অহংকার থেকে ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫টি কর্মেন্দ্রিয় ও মন—তামস অহংকার থেকে ৫টি তন্মাত্রা ও পঞ্চভূত*

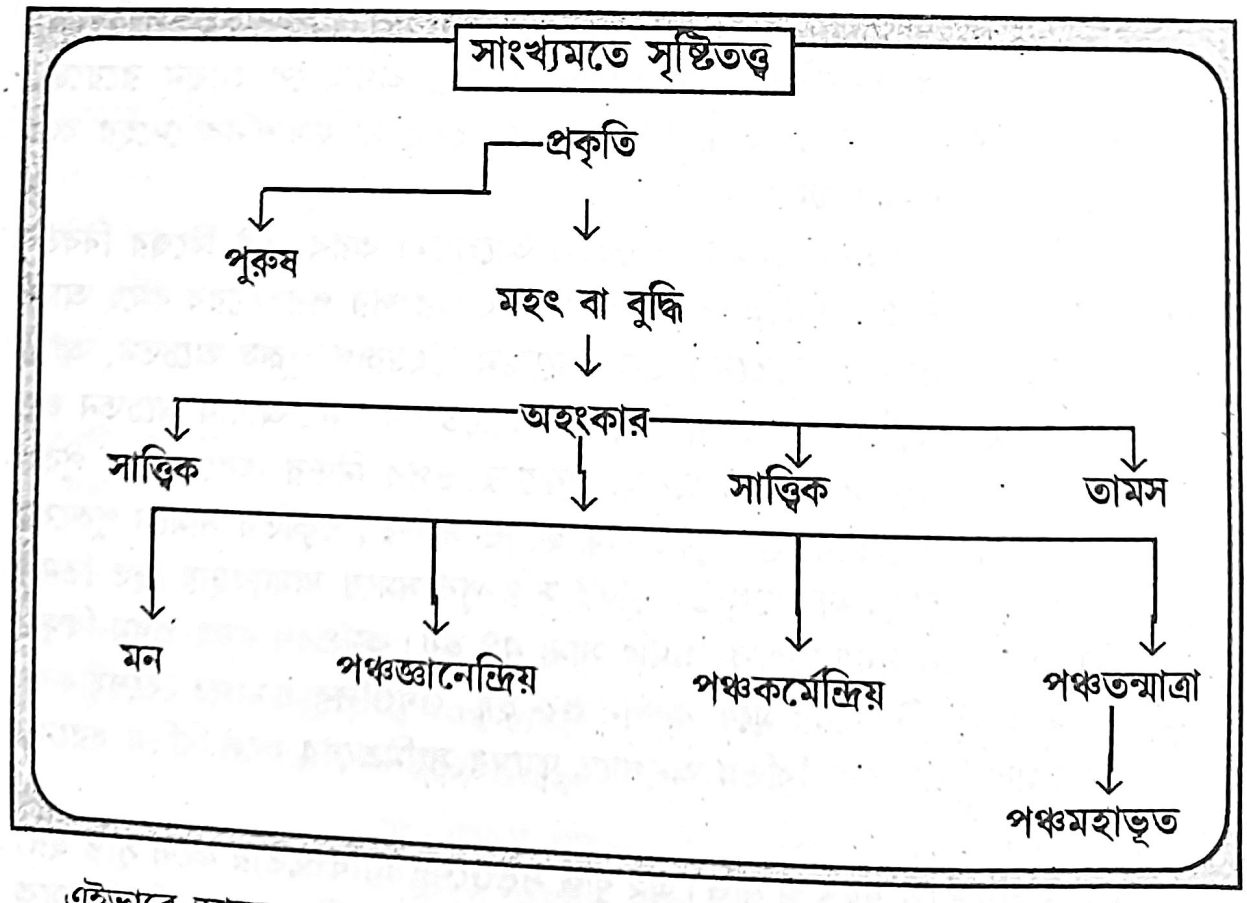


এইভাবে আত্মন্ ও জড়বস্তু মিলে স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বস্তুর বিবর্তন ঘটায়।

আলোর সমান। রজঃ সবসময় গতি ও চঞ্চলতার কারণ, রজঃ জীবনের সব দুঃখেরও কারণ; রজঃ নিজেই দুঃখস্বরূপ। তমঃ বস্তুর জড়তার কারণ, মন, বুদ্ধি এবং অন্যান্য জিনিসের প্রকাশ ক্ষমতা আবৃত করাই এর কাজ। তমঃ নিদ্রা, আলস্য ও মোহ ইত্যাদি সৃষ্টি করে।

*সত্ত্বগুণ—তার স্বভাব*
*রজগুণের স্বভাব ও তমোগুণের স্বভাব*

উৎসাহহীনতা, বিষাদ তমোগুণের অবদান। এরা তিনগুণ একে অপরকে সাহায্য করে। জগতের যে কোন বস্তুতে এই তিনগুণ বর্তমান। জগতের বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টির জন্য এরা একত্রে কাজ করে। বস্তুর প্রকৃতি তার সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে শক্তিশালী গুণের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। এই গুণগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা নিয়ত পরিবর্তনশীল। এদের সংমিশ্রণের ফলে যখন একটির প্রাধান্য দেখা যায়, তখনই জগতের বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়। **বিরূপ পরিণাম (heterogeneity) থেকে জগতের সৃষ্টি।** আর ধ্বংসের সময় প্রতিটি গুণ তার নিজের স্বরূপে ফিরে যায়, অর্থাৎ সত্ত্ব সত্ত্বে, রজঃ রজে, তমঃ তমে। সাধারণত প্রকৃতিতে এই **তিনগুণের সাম্যাবস্থা (equilibrium) থাকে। সৃষ্টির সময় এই সাম্য বিঘ্নিত হয়।**

*গুণগুলির বিরূপ পরিণাম থেকেই বিশ্বের সৃষ্টি*

**সাংখ্যমতে, দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব হ'ল পুরুষ।** পুরুষ **চিৎস্বরূপ, আনন্দময়, সচেতন, অপরিবর্তনীয় ও নিষ্ক্রিয়।** দেহ, মন ও বুদ্ধির সঙ্গে এই আত্মন্‌কে এক করা যায় না। সমস্ত মোহ, সুখ, দুঃখের অনুভূতি থেকে পুরুষ মুক্ত। এই পুরুষ জ্ঞাতা কিন্তু জ্ঞানের বিষয় নয়। **সাংখ্যদর্শন আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেছে,** কারণ গুণের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত বৈষম্য রয়েছে, যদিও সাংখ্যের প্রধান বক্তব্যের সঙ্গে এর মিল নেই। পুরুষ শব্দটির অর্থ হ'ল—ভিতরে যে শায়িত রয়েছে, অর্থাৎ যে আত্মন্ রয়েছেন, তিনিই পুরুষ (পুরি শেতে যঃ)। আত্মার বহুত্ব বলতে হয়ত সাংখ্যদার্শনিক দেহের বহুত্ব বুঝিয়েছেন।

*পুরুষ চিৎস্বরূপ, আনন্দময়, সচেতন, অপরিবর্তনীয় ও নিষ্ক্রিয়*

*আত্মার বহুত্ব স্বীকৃত*

এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব, **এই বিশ্বের বিবর্তন কেমন করে হয়।** যখন জড় প্রকৃতি ও আত্মা বা পুরুষ পরস্পর পরস্পরের কাছে আসে তখনই বিবর্তনের শুরু। সচেতন চিৎস্বরূপ পুরুষ অচেতন, অচিৎ প্রকৃতি ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, আবার অচেতন জড় প্রকৃতিরও সৃষ্টি প্রসঙ্গে পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কিন্তু প্রকৃতি অন্ধ হলেও সক্রিয়। প্রকৃতির সামনে পুরুষের বা আত্মার শুধু উপস্থিতিই সৃষ্টি-পূর্ব সময়ে সাম্যাবস্থায় স্থিত তিনটি গুণের মধ্যে আলোড়ন সঞ্চার করে, অর্থাৎ সাম্য নষ্ট হয়। কর্মপ্রবণ রজঃ প্রথম বিক্ষুব্ধ হয় আর তখন অন্য দুটি গুণের মধ্যে কম্পন শুরু হয়। গুণগুলির ক্রমাগত বিশেষীকরণ ও সমন্বয়নের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন অনুপাতে তাদের সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন ধরনের বস্তু উৎপন্ন হয়।

*প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে গুণের সাম্যাবস্থা নষ্ট হয় তখনই সৃষ্টির শুরু*

**প্রকৃতির প্রথম সৃষ্টি মহৎ বা বুদ্ধি। এই বুদ্ধি সত্ত্বগুণের আধিপত্যের ফলে সৃষ্টি হয়।** বুদ্ধিরূপে জীবের মধ্যে এর অবস্থিতি। নিশ্চয় ও নির্দেশনা এই বুদ্ধির কাজ। বুদ্ধি নিজেকে

এখন আমরা সাংখ্যদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরব এবং শিক্ষাতত্ত্বে ও প্রয়োগে সেগুলির কতখানি প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, তা আলোচনা করব।

প্রথমত সাংখ্যদার্শনিকরা কার্যকারণ তত্ত্বটিকে **(Law of Causation)** বর্ণনা করেছেন সৎকার্যবাদ হিসাবে। এই সৎকার্যবাদের ওপর প্রকৃতিতত্ত্ব নির্ভর করছে। প্রকৃতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য সাংখ্য দার্শনিকরা কিছু কিছু যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন সেগুলি মূলত **ছয়টি** ঃ— (ক) কার্য (effect) উপাদান কারণে (Material cause) **নিহিত থাকে, না হলে কোন ভাবেই এই ধরনের কার্য হতে পারত না।** যেমন, বৃক্ষের বীজের মধ্যেই বৃক্ষের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, অথবা মাটিতে মৃৎপাত্র প্রচ্ছন্ন অবস্থাতে থাকে। (খ) উপাদান কারণের সঙ্গে কার্যের অপরিহার্য সম্পর্ক, কাঠ থেকে দই হয় না, দুধ থেকেই দই উৎপন্ন হয়। (গ) অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কিছু কিছু বিশেষ কার্য বিশেষ বিশেষ কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। যেমন, সুতো থেকে কাপড় হয়, তিল থেকে তেল উৎপন্ন হয়। (ঘ) কার্যের সম্ভাবনা কারণে অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে, পরে তা প্রকাশিত ও প্রকট হয়ে ওঠে। (ঙ) শূন্য থেকে কিছু পাওয়া যায় না। প্রতিটি কার্যেরই কারণ আছে। পাশ্চাত্য দর্শনে একটি সূত্র আছে—Ex nihilo nihilfit (out of nothing nothing comes) (চ) কার্য ও কারণ উভয়েই সমধর্মী। আগুন ও ধোঁয়া, বস্ত্র ও সুতো, মাটি ও মৃৎপাত্র, গাছ ও তার বীজ, ওপরে উল্লিখিত যুক্তিগুলিকে বাস্তব সমর্থন যোগায়। এখন যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়—তা হ'ল এই বিশ্বের কারণ কী? এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সচেতন নীতির দ্বারা পরিচালিত উপাদান কারণ আছে। সাংখ্যদর্শন দুটি বিশেষ পরাতত্ত্বকে এই জগতের সৃষ্টির উৎস বলে স্বীকার করে। সেই দুটি হ'ল জড় প্রকৃতি ও আত্মন্—যারা **প্রকৃতি ও পুরুষ নামে খ্যাত।**

*কার্যকারণ তত্ত্ব— কারণে কার্যের উপাদান নিহিত*

*জড় প্রকৃতি ও অজড় পুরুষ*

সাংখ্যমতে এই জড় প্রকৃতির বিবর্তন মূল উপাদানের পরিণামের ফসল। প্রকৃতি বা মূলা প্রকৃতি এই জড়জগতের প্রথম ও প্রধান কারণ। প্রকৃতি সমস্ত বস্তুর কারণহীন, অজ, নিত্য, অসীম ও স্বনির্ভর উপাদান। এই প্রকৃতি অচিৎ অর্থাৎ বুদ্ধিহীন ও অচেতন, আবার এই **প্রকৃতিই মন ও বুদ্ধির সৃষ্টির পটভূমি রচনা করে।** প্রকৃতি **অতি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, নিরবয়ব, গুণবিশিষ্ট,** অনাশ্রিত একটি **শক্তি, যার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়ের চক্রাকারে ঘূর্ণমান** অবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকৃতি সাংখ্যমতে **তিনটি গুণ বিশিষ্ট—সত্ত্ব, রজ ও তম।** এই তিনটি গুণই সৃষ্টির প্রধান ও আবশ্যিক উপাদান। প্রত্যেকে প্রকৃতিতে বিভিন্ন হ'লেও এই গুণগুলি পরস্পর এমনই অবিচ্ছিন্ন যে এদের আলাদা করা যায় না। এরা ত্রয়ীর মধ্যে একটি ঐক্য তৈরি ক'রে থাকে।

*প্রকৃতি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত গুণবিশিষ্ট অবচেতন শক্তি*

*তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ*

**সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রীতি ও কার্য প্রকাশ, রজোগুণের স্বভাব অপ্রীতি ও কার্যপ্রবৃত্তি, তমোগুণের স্বভাব বিষাদ ও কার্য আবরণ।** এরা তিনগুণই নিত্য সহচর। প্রতি গুণের কার্যের মধ্যে এরা তিনটি থাকে। কারুর প্রাধান্য বেশি, তাকে তখন সেই গুণের কার্য বলা হয়। প্রকৃতির যে উপাদান সুখস্বরূপ, তাকেই বলে সত্ত্ব। সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক, পবিত্র ও

ন্যায় দর্শনে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তা না হ'লে জ্ঞানের মুক্তি, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মৌলিক চিন্তার বিকাশ সম্ভব নয়। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহজ সম্পর্কই জ্ঞানের নিত্যনতুন দিক্ উন্মোচনে সহায়ক হয়ে ওঠে।

*শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক*

উপসংহারে, বলা যেতে পারে যে একটু অনুধাবন করলে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও প্রয়োগের দিক সদর্থকভাবে ন্যায় দর্শনের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। জ্ঞানমূলক তত্ত্বগুলির সুশৃঙ্খল বিন্যাস, বুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতা, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানই আত্ম-মুক্তির উপায়। বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের অনুসন্ধান, জ্ঞানসাম্রাজ্য গড়ে তোলা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। ন্যায়ের পথে শুষ্ক জ্ঞানের চর্চা খানিকটা নীরস আবহাওয়া তৈরি করতে পারে। তবে যুক্তি, তর্ক, মননের পথে জ্ঞান আহরণের যে প্রয়াস তা নিঃসন্দেহে আত্মমুক্তির সোপান। শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বিচারবুদ্ধির চর্চাই শেষ কথা নয়, নিরন্তর মননশীলতা মানুষের লক্ষণ, কারণ, **'মননেন স জীবতি'—মননেই মানুষ বাঁচে।**

ঙ

## সাংখ্য দর্শন

*প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি—শিক্ষাতত্ত্বে ও প্রয়োগে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা*

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা রহস্য উদ্‌ঘাটনে ও সত্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা সব সময় ব্রতী হয়েছে। এই শাখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন দর্শন হ'ল সাংখ্য। প্রাচীন ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণে ও বৌদ্ধ লেখাপত্রে সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই **দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রবক্তা হ'লেন কপিলমুনি।** পরবর্তীকালে এই দর্শনশাখার বিস্তৃতি ঘটে কপিলমুনির শিষ্য-প্রশিষ্যদের বৌদ্ধিক প্রচেষ্টার দ্বারা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আসুরি, পঞ্চশিখ, ঈশ্বরকৃষ্ণ, গৌড়পদ, বাচস্পতি, বিজ্ঞানভিক্ষু ও অনিরুদ্ধ।

*সাংখ্যদর্শনের মূল প্রবক্তা কপিলমুনি*

**সাংখ্যদর্শনের নাম কেন 'সাংখ্য' হ'ল তা নির্ণয় করা মুস্কিল।** কেউ কেউ বলেন, **সংখ্যা থেকে সাংখ্য শব্দটির উদ্ভব।** আবার কোন কোন চিন্তাবিদ বলেন **সংখ্যা কথাটির অর্থ 'সম্যক জ্ঞান'।** যে শাস্ত্র সম্যক্ জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে তাই সাংখ্য।

*'সাংখ্য' নাম কেন?*

পতঞ্জলির যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। স্পষ্টভাষায় বলতে গেলে, **সাংখ্য পরাসত্য জ্ঞানের তাত্ত্বিক দিক আর যোগ হ'ল সেই তাত্ত্বিক জ্ঞানকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তার ব্যবহারিক দিক।** সাংখ্য-যোগকে এককথায় **দ্বৈতবাদী বস্তুবাদ (Dualistic Realism)** বলা হয়। এই দুটি দর্শন শাখায় **দুটি পরাসত্যের (Ultimate Reality)** কথা বলা হয়—**সে দুটি হ'ল পুরুষ ও প্রকৃতি।**

*সাংখ্য ও যোগ খুবই ঘনিষ্ঠ*

তিনটি প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য মস্তিষ্ক, হৃদয় ও কর্মপ্রবণতাকে একই সূত্রে গাঁথা। এই দর্শন শাখা জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যাপারে স্মৃতি (Memory) কে কিছুটা মূল্য দিলেও মূলত প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমানকে ভিত্তি করেই প্রকৃত জ্ঞান লাভের নির্দেশ দিয়েছে। শিক্ষাশাস্ত্রও প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান (analogy) কে তত্ত্বে ও ব্যবহারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। প্রত্যক্ষকে ঘিরে তো শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ (theories), সূত্র ও নীতি (Laws and principles) গড়ে উঠেছে। Thorndike, Pavlov ও গেস্টাল্টবাদীরা তাঁদের পরীক্ষণে প্রত্যক্ষণকে কেন্দ্র করেই চেষ্টা ও ভ্রম তত্ত্ব (Trial and Error Theory), প্রতিবর্তক্রিয়া তত্ত্ব (conditioned Reflex Theory) ও অন্তর্দৃষ্টিমূলক মতবাদ (Insight Mechanism) গড়ে তুলেছিলেন। এই মতবাদগুলি অনেক বেশি প্রয়োগধর্মী বলে এদের 'Mechanism' বলাই শ্রেয়।

*প্রকৃত জ্ঞানলাভ*

*জানা, অনুভব করা ও কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া*

*শিক্ষাশাস্ত্রও প্রমাণ নির্ভর*

আধুনিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ন্যায় দর্শনের জ্ঞান-সামগ্রী বিন্যাস নীতি খুবই উপযোগী। পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলিকে সুসংবদ্ধ আকারে পরিবেশন করা হ'লে শিক্ষার্থীর মনে তাদের একটি সুবিন্যস্তরূপ স্পষ্ট হয় ও ঐ জ্ঞানের প্রয়োগকুশলতাও বৃদ্ধি পায়। ন্যায় দর্শন মতে কোন কিছু জানতে হ'লে প্রয়োজন বিভিন্ন পদার্থ সম্পর্কে জানা। তাই শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, তর্কবিদ্যা, গণিত, জড়বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়দিক অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

*পাঠ্যক্রমের বিন্যাস*

আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতিগত দিকে ন্যায় শাস্ত্রের বিভিন্ন কৌশল অত্যন্ত উপযোগী। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ ও অনুমান মূলত প্রমার উৎস, অর্থাৎ জ্ঞানলাভের ভিত্তিভূমি। ন্যায় শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই নিরত থাকতেন কোন জ্ঞানমূলক বিষয়ে বিতর্ক, আলোচনা, বাগ্‌বিতণ্ডা, বাদী, প্রতিবাদী, পক্ষ, প্রতিপক্ষের যুক্তিতর্কের আদান প্রদান ইত্যাদিতে। ফলে, এগুলির মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানের নির্যাস বেরিয়ে আসত, তা জিজ্ঞাসুর কাছে অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠত। বর্তমান শিক্ষার পদ্ধতিও এই ধরনের প্রক্রিয়াকে মূল নীতি বলে মেনে নিয়েছে। তাই সেমিনার, সিম্‌পোসিয়াম্‌, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি শিক্ষা পরিমণ্ডলে আজ অত্যন্ত পরিচিত শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা। তবে এগুলির দ্বারা যদি শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক চর্চা প্রকৃত অর্থে না হয়, তবে সমস্ত প্রচেষ্টাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই রকম বুদ্ধি অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষার্থীর চিন্তার ক্ষমতা অনেক উন্নত হয়। বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হয়, কোন কিছুকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার যে রীতি গতানুগতিক শিক্ষাপরিমণ্ডলে ছিল, তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শিক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জানা, বোঝা, নতুন নতুন ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োগ অনেক সত্য হয়ে ওঠে। জন ডিউই বলেছেন—শিক্ষা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনর্সৃজন এবং এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তির অন্তহীন বিকাশ সম্ভব।

*পদ্ধতি*

*আলোচনা, তর্কবিতর্ক চিন্তার স্বচ্ছতা নিয়ে আসে*

*শিক্ষা অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন*

জগৎ সৃষ্টি করেন না। নিত্য পরমাণু ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, দেশ, কাল, মন, আত্মা এগুলির দ্বারা জগৎ ও জীব সৃষ্টি করেন। জীবাত্মার মুক্তি ও ঈশ্বরের উপলব্ধির শর্ত হল পদার্থ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ ও প্রমা।

*ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক*

এতক্ষণ আমরা ন্যায় দর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এখন এই দর্শন শাখার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা, আধুনিক শিক্ষার তত্ত্বে ও প্রয়োগে কতখানি, তা ভেবে দেখার বিষয়।

ন্যায়দর্শনচর্চার ফলে বেশ কিছু মননশীল ব্যক্তির ও পণ্ডিতের অবদানে ভারতের সাংস্কৃতিক জগৎ সমৃদ্ধ। ভগবদ্গীতার একটি শ্লোকাংশ বলে 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'—অর্থাৎ সত্য স্বরূপকে জানতে হলে প্রয়োজন বিনয়, জিজ্ঞাসা ও পরিশ্রম। জিজ্ঞাসা সমস্ত বিদ্যার মূল উৎস। ন্যায় দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে কোন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন প্রবল বৌদ্ধিক চর্চা। তাই এই দর্শনে **জ্ঞানতত্ত্বের (Epistemology)** ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই দর্শন শাখা শিখিয়েছে, কেমন ক'রে সঠিক ভাষা ব্যবহার করতে হয়, চিন্তার প্রক্রিয়াগুলিকে সঠিকভাবে বাক্যে ও লেখায় সাজাতে হয় এবং কেমন করে ভাষায় অলংকার প্রয়োগ করতে হয়। **মন, বুদ্ধিকে চর্চার দ্বারা শাণিত করা, পরিশীলিত করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।** আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান সদর্থক ভাবে ন্যায় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

*বৌদ্ধিক চর্চা*

*সঠিক ভাষা ব্যবহার—চিন্তার সঠিক প্রক্রিয়া*

*বুদ্ধির চর্চা*

আধুনিক শিক্ষাশাস্ত্র তত্ত্ব গঠন ও তথ্য আহরণকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে গ্রহণ করে না। **ন্যায় দর্শনও জ্ঞান আহরণ-প্রক্রিয়াতে পূর্বপরিকল্পিত জ্ঞান ভাণ্ডার (ready-made knowledge) সঞ্চয়নকে কোন মূল্য দেয় না।** ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহযোগে বিভিন্ন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে তর্ক বা বিচার-ভিত্তিক জানাকে প্রকৃত জানা বলে মনে করে। ন্যায় দর্শন বলে—প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদির সহায়তায় জ্ঞান সঞ্চয়ন করতে হবে, কথায় ও বাক্যগঠনে সেই জ্ঞানভাণ্ডার ঠিকমত সাজানোর আগে, তর্ক-বিচার-বিবেচনার কষ্টিপাথরে সেগুলির সত্যতা যাচাই করে নিয়ে তারপর জ্ঞান সৌধ গড়ে তুলতে হয়। **আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানও জ্ঞান আহরণের নানা কৌশল সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চলেছে।** প্রতীচ্যে নানা গবেষণা চলছে। Metacognitive Approach বা বুদ্ধি ও বোধি পর্যায়ে যদি জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়াকে উন্নীত করা যায় তবে আহরিত জ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, তখন শিক্ষার্থীদের শুধু মুখস্থবিদ্যার ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে না, জ্ঞান প্রজ্ঞা স্তরে উন্নীত হবে। এই দর্শন শাখা **শিক্ষার্থীদের নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণে ও সেই জ্ঞান কৌশলকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখার লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা দেয়।** আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের লক্ষ্যও শুধু জ্ঞান আহরণ নয়, **ঐ জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তার সত্যতা নিরূপণ করা।** নিত্য নতুন পটভূমিকাতে তার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে সে জ্ঞান সত্য কিনা।

*জ্ঞান সঞ্চয়ন ও বিচার করে গ্রহণ করা শিক্ষাবিজ্ঞানের নীতি*

*জ্ঞান-কৌশলকে প্রয়োগ করা*

**ন্যায়দর্শনের লক্ষ্য হ'ল মোক্ষলাভ যা নির্ভর করে প্রকৃত জ্ঞানের ওপর।** ন্যায়শাস্ত্রে অনুভবকে অগ্রাহ্য করা হয়নি, ফলে জানা, অনুভব করা ও কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া—এই

উপমান : ন্যায়শাস্ত্রে উপমান একটি প্রমাণ। এটি দুটি বস্তু বা বিষয়ের সাদৃশ্যের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মনে করা যাক্, আমি 'ক' নামক বস্তুর সঙ্গে পরিচিত, কোন বিশ্বস্ত বন্ধু মারফৎ 'গ' নামক বস্তুর সঙ্গে 'ক' এর সাদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত হ'লাম। বন্ধুটি 'ক' ও 'গ' উভয়কেই দেখেছে। পরে যখন 'গ' নামক বস্তুটি আমার সামনে এল, আমি তৎক্ষণাৎ 'গ' কে 'ক' এর সদৃশ হিসাবে চিনলাম এবং এটি যে 'গ' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লাম। এই রকম ভাবে আমরা অনেক বিষয়েই জ্ঞান সঞ্চয় করি। এই রকম প্রমাণ খুবই সংকীর্ণ, যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না।

*সাদৃশ্য ভিত্তিক*

এতক্ষণ আমরা প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এবার ন্যায়দর্শনে প্রমেয় বা জানবার বিষয়গুলি কি কি, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। এই প্রমেয় সংখ্যায় ১২ টি, যেমন (১) আত্মা, (২) দেহ (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) তাদের বিষয় (৫) জ্ঞান, (৬) মন (৭) প্রবৃত্তি (৮) দোষ (৯) প্রেত্যাভাব বা পুনর্জন্ম, (১০) ফল বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি (১১) দুঃখ এবং এসব কিছু থেকে (১২) মুক্তি বা অপবর্গ। এ ছাড়াও কিছু পদার্থ আছে, যেমন দ্রব্য, তার গুণ, কর্ম বা গতি, সামান্য বা জাতি, বিশেষ, সমবায়, অভাব।

*প্রমেয় ১২ টি*

*পদার্থ*

ওপরে আলোচিত সমস্ত প্রমেয়ই ভৌতিক (Physical world) জগতের অংশ নয়। আত্মা, বুদ্ধি, মন এরা জড়-জাগতিক নয়। জড়-জাগতিক বস্তু বলতে তাদেরই বুঝি যারা জড় কিংবা জড় প্রকৃতির, যেমন আকাশ, কাল, দেশ। চতুর্ভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ—এই চারটি ভৌতিক জগৎ সৃষ্টি করে। এই ভূতগুলি আবার ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুতের পরমাণুগুলি নিত্য ও অবিভাজ্য। আকাশ একটি ভূত দ্রব্য। দেশ, কাল ভৌতিক প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।

ন্যায় মতে জীবাত্মা তত্ত্ব আলোচনা করা যাক। নৈয়ায়িকরা বলেন জীবাত্মা শাশ্বত, অবিনশ্বর ও বিভূ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে আত্মাকে এক করা যায় না। কারণ আত্মা না থাকলে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন কোন কাজই করতে পারে না। ন্যায় মতে, মন অণুপরিমাণ ও প্রত্যক্ষগোচর নয়। নৈয়ায়িকরা আরও বলেন যে আত্মাকে চৈতন্য প্রবাহের সঙ্গে এক ক'রে ফেলা যায় না। চৈতন্য আত্মার গুণ, কিন্তু অপরিহার্য ও স্বরূপগত গুণ নয়, আগন্তুক গুণ। আত্মা যখন দেহবিশিষ্ট হয়, দেহ যখন মনের সঙ্গে যুক্ত হয়, মন যখন ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন আত্মাতে চৈতন্যগুণের আবির্ভাব হয়। নৈয়ায়িকরা আত্মা বলতে চৈতন্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্য বোঝেন। আত্মা জ্ঞাতা, অহংকারের আশ্রয় ও ভোক্তা। মুক্তির সময় আত্মার কোন চৈতন্য থাকে না। এখন প্রশ্ন ওঠে, এই আত্মাকে আমরা কেমন ক'রে জানব? প্রাচীন ন্যায় মতে, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। নব্য ন্যায় মতে, অন্তর্দর্শন দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব।

*জীবাত্মা*

*দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে আত্মাকে এক করা যায় না*

*চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত গুণ নয়, আগন্তুক গুণ*

## ঈশ্বরতত্ত্ব

নৈয়ায়িকরা মনে করেন, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক। তিনি শূন্য থেকে

'ঐখানে আগুন আছে'। এখন আগুন তো আমরা দেখিনি কিন্তু ঐ আগুনের অস্তিত্বের অনুমান, 'ওখানে ধোঁয়া আছে' ও 'যেখানে আগুন সেখানে ধোঁয়া' এই দুটি জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে গঠিত হয়। ধোঁয়া আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আগুন প্রত্যক্ষ করিনি। 'আগুন আছে' এই অনুমান আমরা প্রত্যক্ষগোচর 'ধোঁয়া' ও আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে একটি সার্বিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে পাই। এই যা প্রত্যক্ষ করেছি ও যা প্রত্যক্ষ করিনি (অথচ একটির অস্তিত্ব আর একটির অস্তিত্বকে প্রমাণ করছে) এই দুই এর সর্ব অবস্থায় যে সম্পর্ক তাকেই ব্যাপ্তি বলে।

*অনুমান*

*প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে যাওয়ার নাম অনুমান অর্থাৎ ধোঁয়া থেকে আগুনের অস্তিত্বে*

সাধারণতঃ অনুমানের তিনটি পদ ও তিনটি অবয়ব থাকে।

ঐ পাহাড়ে ধূম
যেখানে ধূম সেখানে আগুন
ঐ পাহাড়ে আগুন।

*অনুমানের তিনটি পদ ও তিনটি অবয়ব*

এখানে অবয়ব তিনটি। প্রথমে পাহাড়ে ধূমের প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়, ধূম ও আগুনের সার্বিক সম্বন্ধের জ্ঞান ও তৃতীয় সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ পাহাড়ে আগুন আছে, তার অনুমান। **এখানে 'পাহাড়' হচ্ছে 'পক্ষ'** (অনুমিত বিষয়ের আধারকে 'পক্ষ' বলে। যা প্রমাণ করতে চাই তাকে সাধ্য বলে, অর্থাৎ **আগুন এখানে সাধ্য, আর যার মাধ্যমে, যে অনুমান সম্ভব তা হেতু, 'ধূম' এখানে 'হেতু'।** পাশ্চাত্য তর্কবিজ্ঞানে 'পক্ষ' Minor term, সাধ্য Major term ও হেতু Middle term। ন্যায় শাস্ত্রে সাধারণত পাঁচটি অবয়বকে স্বীকার করা হয়েছে—যেমন ঃ

*সাধ্য পক্ষ হেতু*

পাহাড়ে আগুন (প্রতিজ্ঞা)
কারণ পর্বত ধূমবান (হেতু)
যেখানে ধূম সেখানে আগুন, যেমন দেখি চুল্লিতে (উদাহরণ)
পর্বতও ধূমবান (উপনয়)
পর্বত বহ্নিমান (সিদ্ধান্ত)

**ভারতীয় দর্শনে পঞ্চাবয়বী ন্যায় আকারগতভাবে ও বস্তুগতভাবেও সত্য।** এই **অবয়বের স্তরগুলিতে সত্যানুসন্ধান, আবিষ্কার ও সত্য প্রতিপাদন ও তার ব্যাখ্যা নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত থাকে।** অনুমান প্রসার প্রধান উৎস বা প্রমাণ, এর সাহায্যে ব্যক্তি নিজেও জ্ঞান আহরণ করে ও অন্যকে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করে।

*সত্যানুসন্ধান, আবিষ্কার ও সত্য প্রতিপাদন*

**অনুমান নির্ভর জ্ঞান অবরোহণমূলক পদ্ধতি (Deductive) এবং আরোহণমূলক পদ্ধতি (Inductive)-এর সংমিশ্রণে আহরণ করা যায়।** অবরোহণমূলক পদ্ধতিতে সাধারণ থেকে বিশেষে, আরোহণমূলক পদ্ধতিতে বিশেষ থেকে সাধারণ সত্যে পৌছনো যায়।

**শব্দ ঃ** জ্ঞানের আর একটি উৎস হ'ল **শব্দ। ন্যায়দর্শন শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে মনে করে।** বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, নিঃস্বার্থপর লোকের বাক্যের ওপর শব্দের প্রামাণ্য নির্ভর করে। বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য ন্যায় স্বীকার করেছে, তাই বৈদিক বাক্য বা শাস্ত্রজ্ঞ, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বাক্য প্রমাণরূপে গণ্য করা যায়।

*শব্দ*

*প্রত্যক্ষ*

এখন আমরা প্রত্যক্ষের স্বরূপ ও তার বিভিন্ন প্রকার ও রূপ সম্পর্কে আলোচনা করব। আমরা জানি যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সমস্ত জ্ঞান গ্রহণের দ্বার স্বরূপ। যখন **বিষয়ের বা বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি সংযুক্ত হয়, তখনই ঐ বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়।** টেবিলের ওপর বইটি আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়, যখন বইটির সঙ্গে আমার চক্ষুর সংযোগ হয় এবং এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই প্রমা। কিন্তু রজ্জুখণ্ডে সর্পের প্রত্যক্ষ নির্দিষ্ট কিন্তু অসত্য। **প্রত্যক্ষ** দুই ভাগে বিভক্ত—**লৌকিক ও অলৌকিক**। কোন বস্তুর লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ঐ বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সরাসরি যুক্ত হয়। টেবিলটির সঙ্গে আমার চোখের প্রত্যক্ষ সংযোগ হলে, টেবিলটির সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হচ্ছে। **লৌকিক প্রত্যক্ষ দুধরনের—বাহ্য ও আন্তর। বাহ্য প্রত্যক্ষ** তাকেই বলে যখন আমাদের **৫টি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন বস্তু বা বিষয় সংযুক্ত হয়।** এই বাহ্যপ্রত্যক্ষ পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় অনুসারে হয়—যেমন চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ, কর্ণ বা শ্রুতি দ্বারা প্রত্যক্ষ শ্রৌত, স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ স্পর্শন, রসনা দ্বারা প্রত্যক্ষ রাসন, ও ঘ্রাণ বা নাসিকা দ্বারা প্রত্যক্ষ ঘ্রাণজ। তাই প্রত্যক্ষের বিষয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধ। পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ছাড়াও একটি অন্তরিন্দ্রিয় আছে। যেটি মন। মন প্রত্যক্ষ করে সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, জ্ঞান প্রভৃতি। একে মানস প্রত্যক্ষ বলে। অন্তরিন্দ্রিয় কোন বিশেষ দ্রব্য বা গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সমস্ত রকমের জ্ঞানেই অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্যকারিতা থাকে। **অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন ধরনের—সামান্য লক্ষণ, জ্ঞান লক্ষণ ও যোগজ।** অলৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর বা বিষয়ের সরাসরি কোন সংযোগ হয় না। কোন দ্রব্যের সাধারণ গুণ সম্পর্কে ধারণা থেকে ঐ দ্রব্যের অনুরূপ যে কোন দ্রব্য সম্পর্কে বলা হয় সামান্য লক্ষণ, যেমন, একটি ঘটের মাধ্যমে সমস্ত ঘটের ঘটত্ব সম্পর্কে জ্ঞানই সামান্য লক্ষণ। জ্ঞান লক্ষণ স্মৃতি-নির্ভর। আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, চন্দন কাঠ ও তার সুগন্ধ অবিচ্ছেদ্য। তাই দূর থেকে চন্দন দেখলেই বলি সুগন্ধী চন্দন কাঠ দেখছি। এই অলৌকিক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লক্ষণ। যোগাভ্যাসের ফলে যোগী ও সাধকদের যে প্রত্যক্ষ হয়, তাকে যোগজ প্রত্যক্ষ বলে। জৈনদের কেবল জ্ঞান, বৌদ্ধদের বোধি ও বেদান্তীদের অপরোক্ষানুভূতির সঙ্গে যোগজ প্রত্যক্ষের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

*বস্তু ও ইন্দ্রিয় যোগ*

*লৌকিক ও অলৌকিক*

*লৌকিক বাহ্য ও অন্তর*

*বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বস্তুর সংযোগ বাহ্য প্রত্যক্ষ*

*অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন যখন সংযুক্ত হয় বস্তুর সঙ্গে তখন মানস বা আন্তর প্রত্যক্ষ*

*অলৌকিক প্রত্যক্ষ*

*বিশেষ থেকে সাধারণে—স্মৃতি থেকে যে জ্ঞান ও যোগজ এই তিন ধরনের অলৌকিক প্রত্যক্ষ*

## ➢ অনুমান (Inference) ≺

**অনুমান ন্যায়দর্শনের আর একটি প্রমাণ অর্থাৎ প্রমার উৎস।** এখন এই অনুমানকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। **অনুমানের আক্ষরিক অর্থ হ'ল—কোন জ্ঞান-নির্ভর অন্যজ্ঞান (অনু-পশ্চাৎ, মান-জ্ঞান)।** উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়, যেমন, দূরে ধোঁয়া দেখে বলি

বিষয় (৩) সংশয় অর্থাৎ অনিশ্চিত জ্ঞানের অবস্থা, (৪) প্রয়োজন—যা জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, (৫) দৃষ্টান্ত—কোন বিষয়ে যখন বাদী ও প্রতিবাদী কোন উদাহরণকে ভিত্তি ক'রে একমত হয়, তখন তাকে দৃষ্টান্ত বলে। যেমন ঃ প্রতিজ্ঞা—পাহাড়ে আগুন আছে। হেতু—যেহেতু ওখানে ধোঁয়া আছে। উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত —যেখানে আগুন সেখানে ধোঁয়া। (৬) সিদ্ধান্ত—স্বীকৃত কোন বিষয় যখন বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে সিদ্ধান্ত বলে। (৭) অবয়ব বা অনুমানের অঙ্গ, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয় বা সত্য নির্ণয়, (১০) বাদ বা সত্য নির্ণয়ে দক্ষ বিচার, (১১) জল্প বা বিতর্কে জয়লাভের জন্য বাগ্‌যুদ্ধমূলক বিচার, (১২) বিতণ্ডা—অন্যের মত খণ্ডনের জন্য বিচার, (১৩) হেত্বাভাস—অনুমান সংক্রান্ত দোষ, (১৪) ছল—বক্তার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বাক্ চাতুরী, (১৫) জাতি—মিথ্যা উপমানভিত্তিক তর্ক, (১৬) নিগ্রহ স্থান—পরাজয় বরণ।

*তর্কভিত্তিক বস্তুবাদ ও বহুত্ববাদী বস্তুবাদ*

ন্যায় দর্শন **তর্কভিত্তিক বস্তুবাদ এবং বহুত্ববাদী বস্তুবাদ** নামেও পরিচিত। এই দর্শন মতে বস্তুর অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্বন্ধ আমাদের মন ও জ্ঞান নিরপেক্ষ। আমরা জানি বলে এরা আছে। একথা ঠিক নয়, এরা আছে বলেই আমরা এদের জানতে পারি। এখন আমরা ন্যায়শাস্ত্রের জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

*জ্ঞানতত্ত্ব—উৎস চারটি*

ন্যায় দর্শনমতে প্রকৃত জ্ঞানের বা **প্রমার চারটি উৎস, যেমন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ**। জ্ঞান দুধরনের—একটি (১) **প্রমা**, যে জ্ঞান আমি সরাসরি অনুভব করতে পারি, উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—আমার ঘরের পুব দিকে যে কামিনীফুলের গাছটি আছে, তার অস্তিত্ব আমি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সরাসরি জানতে পারছি, এটি বলা হয় অনুভব। আবার স্মৃতির পথ ধ'রে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া—তাও জানা, তবে তা প্রমা নয়। প্রমা চারটি—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। (২) **অপ্রমা** তিনটি সংশয়, ভ্রম ও তর্ক।

*প্রমার স্বরূপ*

*অপ্রমা*

এখন একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—সত্যজ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান থেকে পৃথক কি করে করা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের সত্যতা কী? উত্তরে বলা যেতে পারে, **কর্মে সাফল্য ও অসাফল্যের ওপর নির্ভর করে জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব**। প্রথমত, অনুভব যখন বস্তুর অনুরূপ হয়, তখনই সত্য জ্ঞান হয়। একটি টেবিল প্রত্যক্ষগোচর করলাম ও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলাম—সেই অনুভব সত্য বা প্রমা। দ্বিতীয়ত, মনে কর তুমি তোমার প্রাতরাশের সময় দেখলে তোমাকে যে সুপ খেতে দেওয়া হয়েছে, তা বিস্বাদ। তুমি কোথাও থেকে সামান্য একটু লবণ ঐ সুপে দিয়ে দেখলে যে তা আর বিস্বাদ নয়, তখন তুমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে যে লবণের সঙ্গে স্বাদের একটি সদর্থক সম্পর্ক রয়েছে। আবার লবণ ভেবে গুঁড়ো সাদা কোন দ্রব্য (যেটি লবণ নয়) যদি তুমি সুপে দাও, তবে তোমার জ্ঞান মিথ্যা। অর্থাৎ জ্ঞান তখনই সত্য যখন **সত্যের সঙ্গে তার যথার্থ সংযোগ (correspondence) রয়েছে** ও ঐ জ্ঞান তোমার কাজে লাগছে। এখানে **প্রয়োগবাদী দর্শনের মতবাদের সঙ্গে** এর সাদৃশ্য রয়েছে।

*সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান কী?*

*কর্মে সাফল্য ও অসাফল্য নির্ধারণ করে জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব*

ঘ

## ন্যায়দর্শন

*মূল বৈশিষ্ট্য—শিক্ষাতত্ত্বে ও প্রয়োগে প্রাসঙ্গিকতা*

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা জ্ঞান ও সত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। এইগুলির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের উপজীব্য হ'ল জ্ঞানের যাথার্থ্য ও যুক্তিভিত্তিক জগৎ। ন্যায় বৈদিক শাখা, ফলে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে, কিন্তু প্রতিটি বিষয় যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে অনুপুঙ্খ বিচার করে তবে গ্রহণ করে।

*নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর নাম ন্যায়*

যে প্রণালীর দ্বারা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় তাকেই ন্যায় বলে। যথার্থ জ্ঞানের প্রণালী সম্পর্কে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে 'ন্যায় শাস্ত্র' বলে। এই দর্শন মূলত **প্রমাণ ও প্রমার** সঙ্গে যুক্ত। যুক্তি-সিদ্ধ চিন্তা বা বিচারের প্রণালী নির্দেশ করাই এর কাজ। এই শাস্ত্রটি পুরোপুরি বুদ্ধিনির্ভর ও বিশ্লেষণী।

*প্রমাণ ও প্রমা এই দর্শনে প্রধান*

ন্যায় প্রতিটি শব্দের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে, এখন পাশ্চাত্য দর্শনে এই সংজ্ঞাভিত্তিক দার্শনিক চিন্তার (Speculative) মূল্য স্বীকৃত হচ্ছে। এই ন্যায় শাস্ত্রে প্রত্যেকটি ধারণা সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়, যাতে পরে এই বিষয়ে কোন ধরনের সন্দেহ না থাকে। **ন্যায়দর্শনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হ'ল চিন্তার স্বচ্ছতা ও অভিজ্ঞতার যথার্থতা (accuracy)।**

*প্রধানতম বৈশিষ্ট্য চিন্তার স্বচ্ছতা ও অভিজ্ঞতার যাথার্থ্য*

এই **ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গৌতম মুনি**। তিনি অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রকে, উন্নীত করেছিলেন বাৎসায়ন, বাচস্পতি, উদয়ন, জয়ন্ত, আরও অনেকে। গঙ্গেশের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি' থেকে **নব্যন্যায়ের জন্ম**। পরবর্তীকালে প্রথমে মিথিলা ও পরে নবদ্বীপে এই শাস্ত্রের প্রতিপত্তি ও প্রসার লক্ষ্য করা যায়। **ন্যায়শাস্ত্র কেবল প্রমাণ বা তর্কশাস্ত্র নয়, তা দর্শনশাস্ত্রও**। ন্যায়শাস্ত্র যেমন প্রমাণ শাস্ত্র অন্যদিকে তেমনি তত্ত্ববিদ্যা। **এই শাস্ত্রের মূল লক্ষ্য—সার্বিক জ্ঞান আহরণের মধ্য দিয়ে মোক্ষরূপ পুরুষার্থ লাভ করা**। ন্যায়দর্শনকে মোক্ষবাদী দর্শন ও বস্তুবাদী দর্শন বলা যায়।

*ন্যায়দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম মুনি*

*ন্যায় শাস্ত্র, তর্ক শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র উভয়েই*

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য ন্যায়দর্শনের মূল বিষয়গুলিকে চার ভাগে ভাগ করে নিই ঃ—(১) জ্ঞানতত্ত্ব (২) বস্তুতত্ত্ব (৩) জীবাত্মা, (৪) মোক্ষ ও ঈশ্বর তত্ত্ব। শিক্ষাতত্ত্বে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে গেলে জ্ঞানতত্ত্ব ও পদার্থতত্ত্ব আলোচনাই আমাদের প্রধান কাজ।

*মূল বিষয়গুলি (ক) জ্ঞানতত্ত্ব (খ) বস্তুতত্ত্ব (গ) জীবাত্মা (ঘ) মোক্ষ ও ঈশ্বর*

মহর্ষি গৌতমের মতে ন্যায়দর্শনে যে **ষোলোটি পদার্থ** স্বীকৃত হয়েছে তাদের সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান হলে তবে মোক্ষলাভ সম্ভব। পদার্থ হ'ল পদের অর্থ। ন্যায়দর্শনে যে ষোলটি পদার্থের উল্লেখ আছে সেগুলি হ'ল—(১) প্রমাণ অর্থাৎ প্রমা বা আসল জ্ঞানের উৎস, (২) প্রমেয় হচ্ছে জ্ঞানের

*ষোলটি পদার্থ*